বাংলাদেশের নাট্যচর্চার দুই দশক : রচনা ও অভিনয়

প্রকাশ দাশগুপ্ত*

[সারসংক্ষেপ : মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় বাঙালির ইতিহাসে অনুপম সংযোজন। বাঙালি জাতির পৃথক রাষ্ট্রজীবন গঠনের যেমন একটি রাজনৈতিক দিক রয়েছে, তেমনি শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনেও রয়েছে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা। জনঘনিষ্ঠ শিল্প আঙ্গিক হিসেবে বাংলাদেশের নাটক অতিক্রম করেছে দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে চেষ্টা করেছি গত শতকের আট ও নয় দশকের বাংলাদেশের নাট্যচর্চার গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধানের। নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় প্রসঙ্গটিও আলোচিত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। সময়ের সন্তান হিসেবে বাংলাদেশের নাটক বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে হাতে হাত রেখে চলেছে। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও অর্জনকে তুলে ধরা হয়েছে এই আলোচনায়।]

পূর্ব পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পরিণাম হিসাবে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বাধীন দেশের ক্ষমতায় আসীন হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালে ১২ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বদেশপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন রাষ্ট্রের নামে যে স্বপ্নকে লালন করতেন স্বাধীনতার পর সেই স্বপ্ন অনেকাংশে পূরণ হলো না। মুক্তিযোদ্ধাদের মনে স্বাধীনতার যে স্বপ্ন ছিল, জীবনের সাধনা ছিল, সেকথা স্বাধীনতা-উত্তরকালে কেউ মনে রাখেনি। তাদের উত্তরাধিকার কেউ বরণ করেনি। কাদের সিদ্দিকী তাঁর 'স্বাধীনতা ৭১' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 'কিছু কথা' শিরোনামাঙ্কিত ভূমিকায় লিখেছেন—

> স্বাধীনতা যুদ্ধে অগ্নিঝরা দিনগুলিতে মুক্তিযোদ্ধা ও বীর শহীদরা যেমন কোন মর্যাদা পায়নি, দেশ স্বাধীন হবার পরও সেই একই নীতি অব্যাহত ছিল। যুদ্ধের মুহূর্তে কে কার মর্যাদা দেবে, কে করবে কার বীরত্বের সম্মান। সবাই যার যার জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত। বিশেষতঃ যে নেতাদের উচিত ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার তারা গ্রামে গঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতেন না। মুক্তিযোদ্ধারাও কোনদিন নেতাদের চৌকাঠ মাড়াননি। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজার হাজার গ্রাম গঞ্জের মুক্তিকামী ছাত্র-যুবক, কৃষক-শ্রমিক, মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। মাছের মায়ের যেমন পুত্রশোক নেই, তেমনি আমাদের অনেক নেতারও অচেনা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তেমন কোন অনুভূতিই ছিল না।(সিদ্দিকী, ১৯৮৫ : ১)

কাদের সিদ্দিকী নিজে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস তার অভিজ্ঞতালব্ধ। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলির অভিজ্ঞতা বুকে নিয়ে যে সমস্ত নাট্যশিল্পীরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে নাট্যরচনার দুরন্ত আবেগ দেখা দিয়েছিল। সদ্য স্বাধীনতা লাভের আবেগ ও উত্তেজনায় ১৯৭১—১৯৭৫ সালে প্রচুর নাটক মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হলো। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মমতাজউদ্দীন আহম্মদ

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

(১৯৩৫–) *রচিত স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* (১৯৭১), *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম* (১৯৭১) *বর্ণচোর* (১৯৭২), আলাউদ্দিন-আল-আজাদ (১৯৩২-২০১০)-এর *নিঃশব্দ যাত্রা* (১৯৭২) *নরকে লাল গোলাপ* (১৯৭৪) মোহাম্মদ এহসানুল্লার *কিংশুক যে মরুতে* (১৯৭৫) নীলিমা ইব্রাহিমের (১৯২১–২০০২) *যে অরণ্যে আলো নেই* (১৯৭৪) কল্যাণ মিত্রের *জল্লাদের দরবার* (১৯৭২), আল মনসুরের *হে জনতা আরেকবার* (১৯৭৪) প্রভৃতি প্রচুর নাটকের নাম উল্লেখ করা যায়। স্বাধীনতা অর্জনের আবেগ ও উচ্ছ্বাস এই সমস্ত নাট্যরচনার মূলে সক্রিয় থাকায় অধিকাংশই শিল্পগুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি।

অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা' (১৯৭১–১৯৯৫) প্রবন্ধে এই মর্মে লিখেছেন–

> যুগের দাবিতে রচিত প্রচার সর্ব্বস্ব এ সব নাটকে যুদ্ধের সংবাদ আছে, পাকিস্তানি সৈন্য কর্তৃক নারী ধর্ষণের চিত্র আছে, আছে করতালি নিনাদিত জনপ্রিয় বক্তৃতার মেলা, আছে বিপুল আবেগের উদ্দাম প্লাবন; কিন্তু যা নেই তা হলো শৈল্পিক পরিমিতিবোধ ও স্রষ্টার নিরাসক্ত জীবনচেতনা। (রামেন্দু, ১৯৯৯ : ২০০)

রচনা

সমকালীন বিপন্নতা উত্তরণের কামনায় জাতিসত্তার সন্ধানে ইতিহাস পুরাণের ঐতিহ্যকে ধারণ করে বাঙালির মধ্যে সংগ্রামী চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন নাট্যকার সেলিম আল দীন। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের জীবনকাহিনি নিয়ে রচনা করেছেন *অনিকেত অন্বেষণ* (১৯৭৩), যাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে অনিকেত মানুষের অন্বয় চেতনা। সমাজের অবক্ষয় ও মূল্যবোধের বিচ্যুতি ধরা পড়েছে আবদুল্লাহ-আল-মামুনের *সুবচন নির্বাসনে* (১৯৭৪), *এখন দুঃসময়* (১৯৭৫) নাটকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক ব্যর্থতার যে নজিরই রেখে যান না কেন নাট্য সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। আততায়ীর হাতে প্রাণ হারানোর মাস কয়েক আগে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে শতাব্দী প্রাচীন ইংরেজ প্রবর্তিত নাট্য নিয়ন্ত্রন আইন ১৮৭৬ সংশোধন করে বাংলা নাটকের পথ সুগম করে দেন। সেই সংশোধনীর উল্লেখযোগ্য দুটি বিষয় হলো–

১. প্রমোদ কর ছাড়।
২. অভিনয়ের অনুমতি নেওয়ার পূর্বে নাটকের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখার সাবেকি বিধি বাতিল।

বাংলা নাটক এই সংশোধনীর ফলে আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক সর্বব্যাপী শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের বাণী বাংলা নাটকে জোয়ার নিয়ে এল। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু স্বপরিবারে নিহত হওয়ার পর ক্ষমতায় আসেন খোন্দকার মোশতাক আহম্মদ। সেনাপ্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হন জিয়াউর রহমান। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই খোন্দকার মোস্তাক ৩০ আগস্ট গুরুত্বপূর্ণ দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন–

১. সামরিক ক্ষমতা বলে রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা।
২. বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার রহিতকরণের আদেশ জারি।

এতে ক্ষুব্ধ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও শওকত জামিলের নেতৃত্বে সংঘঠিত অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান ৩–৬ নভেম্বর চারদিন গৃহবন্দি হয়ে পড়েন। কিন্তু অচিরেই মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে জাসদ সিপাহীদের বৃহত্তর অংশ নিয়ে গঠিত 'বিপ্লবী সেনা সংস্থা'র মাধ্যমে পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ৭ নভেম্বর জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করেন। বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিলে জিয়াউর রহমান পুনরায় সেনাপ্রধানের পদ ফিরে পান। তারপরে পাকিস্তানপন্থি ভূমিকা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের পুনর্বাসনে প্রয়াসী হন। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতাকে ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে প্রণয়ন করেছিলেন। জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে সামরিক ফরমান জারি করে পাকিস্তানি দালালদের ভোটাধিকার দান করেন। ১৯৭৬ সালে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পথ সুগম করে ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন।

ক্ষমতাদর্পী জিয়াউর রহমান একদা যার নেতৃত্বে অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, অকপটচিত্তে তৎকালীন প্রচলিত আইন অমান্য করে সামরিক আইনের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সেই মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল তাহেরকে ফাঁসির নির্দেশ দেন। প্রেসিডেন্ট সায়েমকে পদত্যাগে বাধ্য করে ১৯৭৭ সালে ২১ এপ্রিল সেনা প্রধান ও প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করে নিজেকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে তোলেন। ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে তারই নির্দেশিত ফরমানের বলে বাঙালি জাতি আবার দ্বিখণ্ডিত হলো। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বাঙালি হিন্দু বাঙালি ও মুসলিম বাঙালি দুই জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় বার বাংলাদেশি বাঙালি আর ভারতীয় বাঙালি নামে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হলো।

১৯৭৮ সালের ১ অক্টোবর বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি সংক্ষেপে বি.এন.পি. গঠিত হলে ডান ও বাম আদর্শের সমস্ত সুযোগসন্ধানী, উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতালোভী নেতাকর্মীরা এতে এসে যোগ দেন। সামরিক আইন বলবৎ রেখে ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে বি.এন.পি. নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে। অতঃপর সামরিক আইন প্রত্যাহার করে জিয়াউর রহমান নিজের ক্ষমতাকে গণতান্ত্রিকতার পথে নিশ্চিত ও নিরাপদ করে নিলেন। তার এই কর্মপ্রয়াস ও প্রবণতার মূল্যায়নে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন–

> প্রায়ার্ধ যুগের শাসনকালে জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক অর্জন নস্যাৎ, ধর্ম ও রাজনীতির সংযোগসূত্র নতুনভাবে স্থাপন, স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের পুনর্বাসন, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করে পাকিস্তানি ঘরানার জাতীয়তাবাদ পুনরুজ্জীবন, ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিহ্নকরণ, সংবিধানের বিবেচনাহীন পরিবর্তন, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা ও আমলাদের রাজনীতিতে সক্রিয়করণের মত এমন সব নেতিবীজ উপ্ত করে গেছেন তার অঙ্কুর পরিণত বিষবৃক্ষে রূপান্তরিত হয়ে বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশের অহংকারদীপ্ত ইতিহাসে আজও প্রোথিত; সঞ্চারিত করে চলেছে কৃষ্ণ শেকড়। (সিরাজুল, ১৯৯৭ : ৬১)

প্রশাসনিক বিরূপতায় মুক্তিযুদ্ধের নাটক জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর বেশি রচিত হয়নি। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ শামসুল হকের *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৬), সাঈদ আহমদের *প্রতিদিন একদিন* (১৯৭৮) ইত্যাদি। শোষিত-নিপীড়িত বঞ্চিত

মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে এই পর্বে মামুনুর রশীদ নাট্য রচনা করেছেন। তাঁর *ওরা কদম আলী* (১৯৭৮), *ওরা আছে বলে* (১৯৮০) উল্লেখযোগ্য। সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের ছবি ফুটে উঠেছে আব্দুল্লাহ আল মামুনের *শপথ* (১৯৭৮), *সেনাপতি* (১৯৮০) ইত্যাদি নাটকে। সাঈদ আহাম্মদ *শেষ নবাব* (১৯৮৯) নাটকে সিরাজ উদ্‌দৌলার শক্তি, সাহস ও দেশপ্রেমকে সমকালের প্রতিভাসে মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন। এ নাটকের নেপথ্য নায়ক হয়ে উঠেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মমতাজ উদ্দীন আহাম্মদ এর *স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা*(১৯৭৬) নাটকে ইতিহাসের রূপক ব্যঞ্জনায় মুক্তি সংগ্রামের আর্তিই ধরা পড়ে। ফলে এই পর্বে ইতিহাস পুরাণের বিষয় অবলম্বন করেও সমকালের মুক্তি বাসনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পূর্বে নাটকে এই চেতনা সঞ্চারিত হয়নি।

জিয়াউর রহমানের রাজত্বকালে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্ষমতালোভী মানসিকতা, সমাজের মেরুকরণ, ধর্মীয় বিভেদের প্রয়াস ইত্যাদি প্রবণতা ফুটে উঠল তার ফলস্বরূপ আমলাতান্ত্রিক অব্যবস্থা, অবক্ষয়, হতাশা জাতীয় জীবনকে গ্রাস করেছিল। সেসবই উঠে এল মমতাজ উদ্দীনের *ফলাফল নিম্নচাপ* (১৯৭৬) নাটকে। বশীর আল হেলালের *স্বর্গের সিড়ি* (১৯৭৭), গোলাম আম্বিয়া নূরীর *কুমার খালির চর* (১৯৭৮), ফরহাদ মাজহারের *প্রজাপতির লীলালাস্য* (১৯৭৫), *ঘাতক দেশকাল* (১৯৭৬) ইত্যাদি নাটকে সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও অবক্ষয়িত জীবনের দাবি উঠে আসে। বিদেশি নাট্য রূপান্তরের মধ্য দিয়েও বাংলাদেশের নাট্যকারেরা স্বাধীন দেশের স্বপ্ন ও চিন্তাকে লালন করেছেন। সৈয়দ সামসুল হকের *গণনায়ক* (১৯৭৬, <উইলিয়াম সেক্সপিয়রের জুলিয়াস সিজার) মমতাজ উদ্দিন আহম্মদের *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* (১৯৭৬, <লেডি গ্রেগরির *রাইজিং অব দি মুন*), *যামিনীর শেষ সংলাপ* (১৯৭৭, <চেকভের *দি সোয়ান সঙ*), *সৎ মানুষের খোঁজে* (১৯৭৫, <ব্রেখটের *দি গুড ওম্যান অফ সেটজুয়ান*) ইত্যাদি। মুক্তিকামী বাঙালির স্বাধীন চেতনার অন্তর প্রেরণায় অনুবাদের মধ্যে মুক্তি বাসনা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর উপরাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার সাংবিধানিক সূত্রে রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর আবদুস সাত্তার জননির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হলেও সেনাপ্রধান এরশাদ এর হাতে ক্ষমতার রশি থেকে যায়। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সাত্তার ও এরশাদের মনোমালিন্যের সূত্রে সামরিক আইন ঘোষণা করে এরশাদ সাত্তারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দাবি দাওয়াকে সমর্থন করে। ১ নভেম্বর ১৯৮৩ সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। অতঃপর জিয়াউর রহমানের মতো এরশাদও ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধ, গণতন্ত্র ও প্রগতি এই চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে জাতীয় পার্টি গঠন করে সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণের তকমা দিতে প্রয়াসী হন। যদিও তার নেপথ্যে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি। ১৯৮৫ সালে 'নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ' নামে একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলে এরশাদ বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। সরকারের প্ররোচনায় আদর্শহীন মুখোশধারী ছাত্রসংগঠনটি প্রশাসনের পূর্ণ সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে এরশাদ নিয়ন্ত্রিত জাতীয় পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে জিয়াউর রহমানের পথেই এরশাদ সপ্তম সংশোধনী আইন প্রণয়ন করে সমস্ত কৃতকর্মের আইনী বৈধতা করে নেন– ১২ই জুলাই

১৯৮৭ সালে যে সংশোধনী পাশ হয়। এই বিলের সৌজন্যে সামরিক কর্মকর্তাদের বেসামরিক প্রশাসনে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রস্তুত হয়। বিরোধীদের পদত্যাগের কারণে ১৯৮৮ সালে পুনরায় জাতীয় সংসদের নির্বাচন হলে ব্যাপক কারচুপির মধ্য দিয়ে এরশাদের জাতীয় পার্টি পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তখন এরশাদ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী প্রণয়ন করে বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করলে এরশাদ বিচার বিভাগের উপর কর্তৃত্ব ফলিয়ে ইসলামই বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম থাকবে এই রায় কার্যকর করেন। এভাবে বিচার ব্যবস্থাকে ঠুটো জগন্নাথ বানিয়ে সংবিধানের যথেচ্ছ পরিবর্তন সাধন, গণমাধ্যমের উপর নির্লজ্জ নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, শিক্ষার অবনমন, অবাধ বাণিজ্যে আর্থিক নৈরাজ্য, অজস্র নেতিক্রিয়ার মধ্যে ক্ষুব্ধ রাজনৈতিক দলগুলির আক্রমণ, ছাত্র বিক্ষোভ, সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের মুখে পড়ে ১৯৯০ সালে ৬ ডিসেম্বর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর প্রথমে জিয়াউর রহমান পরে এরশাদের হাতে দীর্ঘ ১৪ বছরের সামরিক শাসনের হাত থেকে বাংলাদেশ মুক্তি লাভ করে। ততদিনে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি তলানিতে এসে ঠেকেছে। কেননা কোনো সামরিক সরকারই দেশের জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করেনি। কেবলই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে চলেছে। উন্নয়নের কথা ভাববার কোনো অবকাশ হয়নি। ফলে এই দীর্ঘ অস্থিরতা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া দেশে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার উর্বরভূমি প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু মানুষের হাহাকার, অন্যায় অত্যাচার, জবরদস্তি, মূল্যবোধের অবক্ষয়ে পীড়িত লেখক শিল্পীরা তাঁদের লেখায় সেই সত্যকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। ফলে জিয়াউর রহমানের শাসনকালে সাহিত্যের যে প্রবণতাগুলি ছিল এখানে তারই অনুসৃতি দেখা গেল। মৌল কোনো পরিবর্তন বা পালাবদল সূচিত হলো না।

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য প্রাথমিক উন্মাদনা কাটিয়ে নয়ের দশকে চূড়ান্ত শিল্পসুষমা লাভ করেছে। মমতাজ উদ্দীন আহমদ এর অগ্রপথিক। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় জীবন যত অসহনীয় হয়েছে, অস্তিত্বের সংকট ঘনীভূত হয়েছে, ততই মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন সাধনার দিনগুলো মানুষকে বেশি করে আকর্ষণ করেছে। এ প্রসঙ্গে মমতাজ উদ্দীনের বিখ্যাত নাটক *কি চাহ শঙ্খচিল* (১৯৮৫)। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা নারী ধর্ষণের কলঙ্কিত ইতিহাসকে ভিত্তি করে নির্মম রাজনীতির ছবি তুলে ধরেছেন। অধ্যাপক জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলাদেশের নাটকের সন্ধানে' নামক প্রবন্ধে মমতাজ উদ্দিন সম্পর্কে বলেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে বাঙালি মুসলমানের মনে যে আলো-আশা-স্বপ্ন জমা হয়েছিল, দু'দশক পরেও যার শিহরণ যেকোন বাংলাদেশীয় চিত্তকে ছুঁয়ে যায়, মমতাজ উদ্দিন সেই অভিজ্ঞতা ও সজীব স্মৃতির ভাষ্যকার' (জয়ন্ত, ২০০১)।

কি চাহ শঙ্খচিল নাটকে মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহিদের রক্তে, অগণিত নারী ধর্ষণের বিনিময়ে মানুষ কী পেল, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের গজিয়ে ওঠা রাজনীতিবিদদের কূটকৌশলে তাদের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ছবি তুলে ধরেছেন। ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছতে স্বামী আলী নেওয়াজ তার ধর্ষিতা স্ত্রী রৌশনারা ও তার ঔরসজাত সন্তানকে কী নির্মমভাবে ব্যবহার করেছে। এমনকি নিজের সন্তানকে ছাউনির সন্তান জ্ঞানে ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছে শ্বাসরোধ করে হত্যা

করতেও দ্বিধা করেনি। কারণ সে তো ছিল তার বড়ো হওয়ার সোপান। প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলেই তার ঐ পরিণাম।

> স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আটের দশকেই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন মামুনুর রশিদ। নয়ের দশকে তিনি রচনা করেন 'ইবলিশ' (১৯৮২), 'এখানে নোঙর' (১৯৮৪), 'খোলা দুয়ার' (১৯৮৪), 'গিনিপিগ' (১৯৮৬) ইত্যাদি নাটক। নাটকগুলিতে শোষিত, বঞ্চিত মানুষের সমবেত প্রতিরোধ গড়ে তোলার বাসনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'এখানে নোঙর' নাটকে সফুরা যেমন বলেন 'আমি যাই– এই চড়ায় আবার আবাদ অইবো– সোনার ফসল অইবো–কোনো এক ফসল তোলার দিনে আমি ফিরা আসুম, ততদিন তোমরা একলগে থাইকো' (মামুনুর, ২০০৫)।

এই সমবেত সংগ্রামের বাণীকেই ভাষা দিতে চেয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ আল মামুন নয়ের দশকে রচনা করেছিলেন *এখনও ক্রীতদাস* নামে বিখ্যাত এক নাটক। যেখানে শোষকগোষ্ঠী এক অদ্ভুত কৌশলে অদৃশ্যবন্ধনে বেঁধে সাধারণ মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করে রেখেছে। ক্রীতদাসের বন্ধন ছিন্ন করতে গিয়ে বাক্কা মিয়ারাই মরে বটে কিন্তু মুক্তির যে পথকে তারা সাধারণের মধ্যে জাগিয়ে দিয়ে যায় তা মরে না। ফলে প্রতিবাদ প্রতিরোধটা চলতেই থাকে। সেলিম আল দীনের *কিত্তনখোলা* (১৯৮৬) নাটকে রক্তচক্ষু শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে নিরন্ন সাধারণ মানুষের সংগ্রামী চেতনার জয় ঘোষিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে রক্তদানের প্রেরণাকে সম্বল করে শ্রেণি সংগ্রামে সামিল হয়েছে সাধারণ মানুষ। আবদুল মতিন খানের *মাননীয় মন্ত্রীর একান্তসচিব* (১৯৮০), *সম্মেলন* (১৯৮১) প্রভৃতি নাটকে ভণ্ড রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের নির্মমতার ছবি ভাষা পেয়েছে। সেখানে জনতার রোষ ও বিদ্রোহ মূর্ত হয়ে উঠেছে। শ্রেণিদ্বন্দ্বের পটভূমিতে *জনে জনে জনতা* (১৯৮৪), *পোষ্টার* (১৯৮৬) নাটকদুটি রচিত হয়েছে। সোলায়মানের *ইঙ্গিত* (১৯৮৫), *এই দেশে এই বেশে* (১৯৮৮) উত্তরবঙ্গের কৃষককুলের শোষণ ও বঞ্চনার ছবিকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। এককথায় সমাজ ও অধিকার চেতনা ঐ পর্বের নাটকের মূল ভিত্তি ও প্রেরণা হয়ে উঠেছে।

ইতিহাস ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে শোষণের রূপকে মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামীদের উপর নির্মম অত্যাচারের ছবি সৈয়দ শামসুল হক *নূরুলদীনের সারাজীবন* (১৯৮২) নাটকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সাঈদ আহমদের *শেষ নবাব* (১৯৮৯) নাটকের মধ্যেও সিরাজউদ্দৌলার অন্তরালে ফুটে উঠে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি। আবদুল মতিন খান *গিল গামেশ* (১৯৮২) নাটকে গিল গামেশের স্বপ্ন ও সংগ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে দেন মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাঙালির স্বপ্ন ও সংগ্রামকে। এই সমস্ত নাটকগুলি ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণাশ্রিত হয়েও তার মধ্যে সীমায়িত হয়ে পড়েনি। সমকালীন চিন্তাচেতনা ও ভাব প্রবণতার প্রকাশে সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে সমাজবাস্তবতাকে ভিত্তি করে নয়ের দশকে আরও বেশকিছু নাটক রচিত হয়েছে। আবদুল্লাহ আল মামুন রচনা করেছেন *আয়নায় বন্ধুর মুখ* (১৯৮৩), *চারদিকে যুদ্ধ* (১৯৮৩), *তোমরাই* (১৯৮৯), *আমার সন্তানেরা* (১৯৮৯), *কোকিলারা* (১৯৯০) ইত্যাদি। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব কিংবা ভাব-গভীরতা না থাকলেও সমাজজীবনের সর্বব্যাপী হতাশা, নৈরাশ্য, প্রত্যয়হীনতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় সমস্তই মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে তার মধ্যেও তিনি তরুণসমাজকে নবতর মূল্যবোধে জেগে উঠে সমাজ বদলের জন্য আহ্বান

জানিয়েছেন। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর আত্মমর্যাদা উদ্ধারের প্রয়াস দেখা যায় *কোকিলারা* নাটকে। সৈয়দ শামসুল হক রচিত *এখানে এখন* (১৯৮৮) নাটকে ধনিক শ্রেণির স্বার্থপরতা, ষড়যন্ত্র ও লালসায় ছিবড়ে হয়ে যাওয়া সাধারণ মানুষের করুণ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। ইতিহাস ঐতিহ্যের মধ্যে যেমন, তেমনি অনুবাদ নাটকের ধারাতেও সমকালীনতার ছাপ ফুটে ওঠে। নয়ের দশকে রচিত জিয়া হায়দারের *ডক্টর ফষ্টাস* (১৯৮১) (<ক্রিষ্টোফার মার্লোর 'দি ট্রাজিকাল হিষ্টরি অফ ডক্টর ফষ্টাস'), মহিদুল ইসলামের *চিড়িয়াখানা* (১৯৮৭) (<আনবির 'দি জু ষ্টোরি'), খোন্দকার আশরাফ হোসেনের *রাজা ঈদিপাস* (১৯৮৬) (<সফোক্লিসের 'কিং ঈদিপাস') ইত্যাদি অনুবাদ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য নাটকের অনুকৃতি ও অনুসৃতির মধ্য দিয়ে দেশজ নাট্যরীতির সাঙ্গীকরণের প্রয়াস দেখা যায়। সুতরাং রাজনেতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে বাংলাদেশের নাট্যচর্চা জনজাগরণ ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে গেছে।

অভিনয়

বাঙালির নাট্যচর্চা দেশভাগের পর একই ঐতিহ্য সত্ত্বেও স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত যে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের বাঙালির জীবন অতিবাহিত হয়েছে, তার কোন অভিঘাত পশ্চিম বঙ্গের বাঙালি জীবনে পড়েনি ফলে বাঙালির সংস্কৃতি তথা নাট্যচর্চাও ভিন্নতর গতিতে এগিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে উঠার পর পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা নিজস্ব আইডেনটিটি খুঁজে পেতে হন্যে হয়েছে। নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশও পেয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠার আগেই ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়' গড়ে উঠেছিল ঠিকই, বেতার ও টেলিভিশনের নাট্য প্রযোজনার সীমানা পেরিয়ে মঞ্চপ্রযোজনায় সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে স্বাধীনতার পর। আতাউর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে মঞ্চস্থ হয় মধুসূদন দত্তের *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* নাটক। বলাবাহুল্য এ নাটক সাবেকি বাঙালির ঐতিহ্যেরই অনুসারী। স্বাধীন বাংলাদেশের দেশকালের জাতীয় সংকট, স্বপ্ন-সাধনার অভিঘাত নিয়ে উঠে আসা নয়।

১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাসনকালে তৎকালীন বাংলাদেশের 'আরণ্যক নাট্যদল' (১৯৭২), 'থিয়েটার বেইলী রোড' (১৯৭২) 'ঢাকা থিয়েটার' (১৯৭৩), 'থিয়েটার তোপখানা' (১৯৭২), 'নাট্যচক্র ঢাকা' (১৯৭২) প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই কালপর্বে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* ছাড়াও মঞ্চস্থ করে বাদল সরকারের *বাকি ইতিহাস* (১৯৭৩), মলিয়র রচিত আলী যাকের অনূদিত *বিদগ্ধ রমণীকুল* (১৯৭৩), রশিদ হায়দার অনূদিত *তৈল সংকট* (১৯৭৩), এডওয়ার্ড এলবি রচিত আলী যাকের অনূদিত *এই নিষিদ্ধ পল্লীতে* (১৯৭৩), আলবেয়ার কামু রচিত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অনূদিত *ক্রস পারপাস* (১৯৭৩), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *বহিপীর* (১৯৭৪) ব্রেশট রচিত আলী যাকের অনূদিত *সৎ মানুষের খোঁজে* (১৯৭৫) ইত্যাদি নাটক। ১৯৭৩ সালে ৩ ফেব্রুয়ারি 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়' প্রথম দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নের প্রথা চালু করে (বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার নির্দেশিকা, ২০০৫)।

নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের মূল প্রবণতা অনুবাদ নাটক অভিনয়ের দিকে। তাদের স্পষ্ট অভিমত : 'আমাদের মানুষ ও সমাজকে নিয়ে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য সম্বলিত নাটক মঞ্চায়নে 'নাগরিক' আগ্রহী, যা শুধু দেশি মৌলিক নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিদেশি রূপান্তরও অনুবাদ নাটক মঞ্চায়নের মধ্যেও বিস্তৃত' (সেলিম, ২০০৮)।

অনুবাদের মধ্য দিয়েই 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়' পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের সঙ্গে বাংলাদেশের নাটকের একটা যোগসূত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'থিয়েটার' (বেইলী রোড) রামেন্দু মজুমদারের নির্দেশনায় মুনীর চৌধুরীর *কবর* (১৯৭৪) তিন বার মঞ্চস্থ হয়। আব্দুল্লাহ আল মামুনের রচিত ও নির্দেশিত *সুবচন নির্বাসনে* (১৯৭৪), *এখন দুঃসময়* (১৯৭৪) বহুবার অভিনীত হয়েছিল। *কবর* নাট্যাভিনয়ের মধ্যদিয়ে থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠী প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে নাট্যচর্চাকে এক দুঃসাহসিক ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত এই নাটকে সংগ্রামের ঐতিহ্য, ভাষাপ্রেম জাতীয় জীবনে নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সমালোচক মন্তব্য করেছেন–

> কবর নাটকের রচনা ও অভিনয় প্রকাশ করেছিলো বাংলা নাট্যভাষার প্রতিবাদী শক্তিটিকে। একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি অঙ্গীকার, ভালোবাসা এবং তাকে রক্ষার আর্ত চিৎকারের পাশাপাশি অপবলশালী রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক পরিচালিত নৃশংসতা ও গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে নাটকটি সুতীক্ষ্ণ রাজনৈতিক ও মানবিক বক্তব্যকে এক কালোত্তীর্ণ চিরায়ত শিল্পভাষায় আত্তীকরণ করে নেয়। (সেলিম, ২০০৮ : ২)

১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত অপর একটি নাট্যগোষ্ঠী 'আরণ্যক নাট্যদল' মুনীর চৌধুরী *কবর* (১৯৭২), মামুনুর রশীদ রচিত ও নির্দেশিত *পশ্চিমের সিঁড়ি* (১৯৭২), *গন্ধর্ব নগরী* (১৯৭৪) মঞ্চস্থ করে। মামুনুর রশীদ সর্বহারার প্রতিবাদ চেতনাকেই নাট্যরূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে পরবর্তীকালে তিনি দারুণভাবে রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠেন। আরণ্যকের একবছর পরই ১৯৭৩ সালে 'ঢাকা থিয়েটা' প্রতিষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকালে 'ঢাকা থিয়েটার' সেলিম আল দীনের *সংবাদ কার্টুন* (১৯৭৩), *জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন* (১৯৭৪), হাবিবুল হাসান রচিত ও নির্দেশিত *সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণ* (১৯৭৩), আল মনসুরের *বিদায় মোনালিসা* (১৯৭৪) অভিনীত হয়। নাটকগুলি বহুবার অভিনীত হয়েছিল। নাটকগুলিতে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ছবি ব্যঙ্গে প্রতীকে ফুটে উঠেছে। সংগ্রামী ও স্বাধীনতা প্রিয় মানুষদের চাহিদা মাথায় রেখে দেশজ রীতিতে স্বদেশীয় বিষয়ে নাট্য প্রযোজনায় প্রায় ঢাকা থিয়েটারে দেখা যায়।

১৯৭২ এ প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার (তোপখানা) এই কালপর্বে তিনটি নাটক *কবর*, *সুবচন নির্বাসনে* ও *এখন দুঃসময়* ১৯৭৪ সালে একাধিকবার মঞ্চস্থ করে। এই নাটকগুলি থিয়েটার (বেইলী রোড) দ্বারাও বহুবার অভিনীত হয়েছে। সুতরাং প্রথম পর্বে অভিনয়ের কিছু না থাকলেও নাট্যাভিনয়ের প্রয়াসকে স্বাগত জানাতে হয়। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'নাট্যচক্র' ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে উনিশটি নাটক একাধিকবার মঞ্চস্থ করে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেলিম-আল-দীনের *এক্সপ্লোসিভ ও মূলসমস্যা*, *জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন*, করিম বাওয়ালীর *শত্রু* অথবা *মূল মুখ দেখা*, আল মনসুরের *রেভ্যুলুশন* এবং *খৃষ্টাব্দ সন্ধান*, *রোলার এবং নিহত এল.এম.জি.*, নিরঞ্জন অধিকারীর *কালো অশোক লাল ফুল*, শাহনুর খানের *পেন্ডুলামের গুণ* আনোয়ার

তালুকদারের *দাঁড়াবো শুধুই*, *আজমিরী ওয়ারেশ* এবং *উন্মোচন* ইত্যাদি। নতুন নতুন নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে 'নাট্যচক্র' বিষয়, উপস্থাপনে, আঙ্গিক, অভিনয় ও মঞ্চসজ্জা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকে।

১৯৭২ সালে 'বহুবচন' প্রতিষ্ঠিত হয় চিরাচরিত নাট্যাঙ্গিকের থেকে স্বতন্ত্র কিছু করার বাসনা নিয়ে। ফরহাদ মজহার রচিত *প্রজাপতির লীলা লাস্য* (১৯৭২), শাহীনুর খানের *সভাপতি বলবেন* (১৯৭২), ফজলুর রেহমানের *আমি রাজা হব* (১৯৭২), সেলিম আল দীন রচিত *সর্প বিষয়ক গল্প* (১৯৭২), সালেহ আকরামের *নিরঞ্জন ফিরে এসো* (১৯৭২), সাযযাদ কাদিরের *৭৫০ সিংহ* (১৯৭৪), আবু বকরের *বিপন্ন ধারা পাঠ* (১৯৭৪) অভিনীত হয়েছিল। এই নাট্য দলগুলি প্রতিষ্ঠাপর্ব থেকেই দেশকালের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে বৈদেশিক নাট্যবিষয়কে গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার প্রয়াস পেয়েছে। একইসঙ্গে দেশজ ঐতিহ্যের অনুভূতিতে দেশের স্পন্দনকে ধরে দিতে প্রয়াসী হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্ধদশকের মধ্যেই মঞ্চ নাটকের বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুত হয়েছে। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শিল্পকলা একাডেমি'। এই একাডেমি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম নাট্যোৎসবের আয়োজন করে। এই নাট্যোৎসব ঢাকার নাট্যগোষ্ঠীদের মধ্যে সীমায়িত থাকলেও পরবর্তীকালে জাতীয় নাট্যোৎসবে চট্টগ্রামের নাট্যগোষ্ঠী তাতে অংশগ্রহণ করে। জেলাওয়ারি নাট্যোৎসবও প্রচলিত হয়েছিল। ফলে নাট্য প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সত্তর দশকের দ্বিতীয় পর্বে নাট্যচর্চার জোয়ার আসে। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নাট্যপত্র 'ত্রৈমাসিক থিয়েটার' আত্মপ্রকাশ করে। ফলে নাট্যাভিনয়ের ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। সুতরাং নাট্যচর্চার জন্য আবশ্যিক পত্রিকা, নাট্যকার, নাট্যদল, পরিচালক, অভিনেতা এমনকি নাট্য একাডেমি সর্বোপরি নাট্যমোদি দর্শক বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাঁচ বছরের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল। কাজেই এই কালপর্ব নাট্যবিপ্লবের সূচনা কাল হিসাবে চিহ্নিত।

স্বাধীন বাংলাদেশে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সুস্থিতি আসার আগেই অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক পটবদল ঘটে। সেনা অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে একনায়কত্ব কায়েম করে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পটবদলের ফলে অখণ্ড জাতিসত্তার উপর শোচনীয় আঘাত নেমে এলে বাংলাদেশের নাট্যচর্চা প্রবল ঝাঁকুনি পেয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঙালির নিজস্ব জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখার অঙ্গীকার নিয়ে নতুন কিছু নাট্যদল গড়ে উঠেছে। ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'নান্দনিক', 'সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী', ১৯৭৮ এ 'পদাতিক নাট্য সংসদ', ১৯৮০ সালে 'ঢাকা পদাতিক' প্রভৃতি নাট্যদল। এছাড়াও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'সংলাপ গ্রুপ থিয়েটার' (১৯৭৮), 'সুবচন নাট্য সংসদ' (১৯৭৭), 'বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' (১৯৭৮), 'ঢাকা ড্রামা দল' (১৯৭৭) প্রভৃতি।

এই কালপর্বে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় মঞ্চস্থ করে সাঈদ আহমেদ রচিত *মাইল পোষ্ট* (১৯৭৬) ব্রেশট এর *হের পুন্টিলা এন্ড হিজ ম্যান ম্যাট্টি* অবলম্বনে আসাদুজ্জামান নূর রচিত *দেওয়ান গাজীর কিস্সা* (১৯৭৭), ডি.এল. রায়ের *সাজাহান* (১৯৭৯), রবীন্দ্রনাথের *অচলায়তন* (১৯৮০) প্রভৃতি নাটক। বিদেশি নাট্য যাত্রা ও রূপান্তরে মুখ্য প্রবণতা হলেও নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় কালোত্তীর্ণ ভালো নাটকের প্রতি আগ্রহী ছিল। বিশেষ দেশকালে নিজেদের সীমায়িত করতে চায়নি। তাই

রবীন্দ্রনাথ কিংবা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক অভিনয়ে কোনো দ্বিধা করেনি। নাট্য প্রেরণা সম্পর্কে লিখেছেন–

> নাটক প্রযোজনায় আমরা বিচিত্রতায় বিশ্বাসী। যে কোন ভাষাতে অথবা যে কোন নাট্যকারের রচনা হোক না কেন ভালো নাটক দেশকালের উর্ধ্বে। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা রেখায় আবদ্ধ নয়। বিশেষ কোন মতবাদ বা দর্শনে বিশ্বাসী নই বলে বিশেষ ধরনের নাটকে আমাদের আগ্রহ শূন্য। আমাদের লক্ষ্য-দেশি বা বিদেশি ভালো নাটক এবং তা ভালোভাবে উপস্থাপন করা।

'থিয়েটার' নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত জিয়া আনসারীর *চোর চোর* (১৯৭৬), আবদুল্লাহ আল মামুনের *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৬), মমতাজ উদ্দীনের নাট্যানুবাদ রবীন্দ্রনাথের *দুই বোন* (১৯৭৮), আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত ও নির্দেশিত *সেনাপতি* (১৯৭৯) প্রভৃতি নাটক। আবদুল্লাহ আল মামুন মৌলবাদী ধর্মরাজনীতির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের সৈনিকদের আদর্শ ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। 'ঢাকা থিয়েটার' সেলিম আল দীন রচিত *মুনতাসীর ফ্যান্টাসী* (১৯৭৬), *শকুন্তলা* (১৯৭৮), *চর কাঁকড়ার ডকুমেন্টরী* (১৯৭৭), হাবিবুল হাসান রচিত *কসাই* (১৯৭৭), সাজেদুল আউয়াল রচিত *ফণীমনসা* (১৯৮০) প্রভৃতি নাটক নাসির উদ্দিন ইউসুফের নির্দেশনায় অভিনয় করে। সমকালীন দুষ্ট রাজনীতি, দুস্থ ও রুগ্ন সমাজজীবনের ছবি এই কালপর্বের নাটকে ফুটে ওঠে। 'নাট্যচক্র' জহির রায়হানের আবুল হাসানাত রূপান্তরিত *লেট দেয়ার বি লাইট* (১৯৭৬) নাটকটি ১১৩ বার অভিনয় করেছিল। এ নাটক প্রযোজনার মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিভ্রান্ত মানুষকে আলোর দিশা দেখাতে চেয়েছেন। আবু সালেক খানের *প্রত্যাবর্তনের দেশে* (১৯৭৬) জগলুল করিম শামীমের *উদ্ধার* (১৯৭৭) প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়েছিল। সামাজিক ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ সমাজজীবনে মুক্তির বাণী পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েই ১৯৭৮ সালে 'পদাতিক নাট্য সংসদের' জন্ম। তাদের প্রথম প্রযোজনা জসীম উদ্দীনের কাহিনি অবলম্বনে এস. এম. সোলায়মান রূপান্তরিত *সোজন বাদিয়ার ঘাট*। এস. এম. সোলায়মান রচিত *তিন রোস্তমের গপ্পো* (১৯৭৯), কাজী রফিক রচিত *মনসার পালা* (১৯৮০) ইত্যাদি নাটকের মধ্যে দেশজ ঐতিহ্যের সূত্রে সাবেকি মূল্যবোধ ফিরে পাওয়ার প্রয়াস আছে।

'প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যগোষ্ঠী' ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হতাশা আর যন্ত্রণার গল্প শোনানোর জন্য নয়, নিবিড় বাস্তবতাকে ভিত্তি করে নাট্যরস পরিবেশন করার জন্য। ১৯৭৩ সালেই মনোজ মিত্রের *সাজানো বাগান* মঞ্চস্থ করে। তারপর সরোজ রায়ের *গরুর গাড়ির হেড লাইট* (১৯৭৬), রতন কুমার ঘোষের *দোহাই হাসবেন না* (১৯৭৯), মনোজ মিত্রের *নৈশভোজ* (১৯৭৯), রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের *অমর শহীদ গোদাই* (১৯৮০) প্রভৃতি নাটকে অনাবিল হাস্যরসের উৎসার ঘটিয়ে যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষকে মুক্তিদানের প্রয়াস পেয়েছে। 'সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী' ১৯৭৭ সালে আনোয়ার তালুকদারের *ডেট লাইন ঢাকা* নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অঙ্গীকার করে নিয়ে সময়ের আবেদন তুলে ধরতে চেয়েছে। মানুষের প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও অনন্তসম্ভাবনার প্রতি সুগভীর আস্থা নিয়েই ১৯৭৭ সালে 'সুবচন নাট্য সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। রঞ্জন দেবনাথের *নিচু তলার মানুষ* (১৯৭৭), *একটি পয়সা দাও* (১৯৭৭), হাসনাত আব্দুল হাই-এর *সামনে যাই হোক ট্রেন চলবে* (১৯৭৮) হাবিব আহসানের *তরুণ এবং বহমান ক্ষত* (১৯৭৯) ইত্যাদি নাটক এই কালপর্বে সুবচন নাট্য সংসদ দ্বারা অভিনীত হয়েছিল।

'বহুবচন নাট্য গোষ্ঠী' আন্তরিক সততা ও নিজস্ব প্রয়োগরীতির বিশিষ্টতায় ফরহাদ মজহারের *ঘাতক দেশকাল* (১৯৭৬), সাঈদ আহমদের *প্রতিদিন একদিন* (১৯৭৮) অভিনয় করে। ঢাকা নান্দনিক পরিবর্তিত 'নান্দনিক ৭৭' নামে সুশান্ত সাহার *আমার সোনার হরিণ চাই* (১৯৭৭) অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রচারের আলোয় আসে। অতঃপর তারা রবীন্দ্রনাথের *বিনি পয়সার ভোজ* (১৯৭৮), *রক্তকরবী* (১৯৮০), *শেষরক্ষা* (১৯৮১) অভিনয় করে। নাটক সমকালীনতা থেকে চিরকালীনতার মধ্যে মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেতে চায়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর আরেক সেনাপ্রধান এরশাদ ক্ষমতার শীর্ষে উঠে আসে। ফলে সরকারি আনুকূল্য লাভের স্বপ্নও তিরোহিত হয়। কিন্তু নাট্যকর্মী শিল্পীদের আন্তরিক প্রয়াসে যেমন নাট্যোৎসব গড়ে উঠেছিল, তেমনি ১৯৮০ সালে গড়ে ওঠে 'বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন'। এই ফেডারেশন নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১. আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে নাটককে মুক্ত করা ২. মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী কালাকানুন লোপের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা, ৩. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলা, ৪. সমাজজীবনের সঙ্গে নাটককে একাত্ম করে তোলা, ৫. নিয়মিত নাট্য প্রকাশনা, ৬. নাট্যবিষয়ক সংগ্রহশালা গঠন করা, ৭. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নাট্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ৮. জাতীয় নাট্যোৎসবের আয়োজন করা। মূলত বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নাট্যচর্চা সংঘবদ্ধ আন্দোলনে শামিল হলো। এরশাদের রাজত্বকালে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি ও তাদের সংস্কৃতি রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে মেরুকরণ ঘটে যায়। 'স্বাধীনতা উত্তর ঢাকা কেন্দ্রিক মঞ্চ নাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা' গ্রন্থে সেলিম মোজাহার বলেছেন– 'বাঙালি জাতি সত্তা পুনরায় নিক্ষিপ্ত হয় অতীত গর্ভে; বারুদের তোড়ে উড়ে যায় মূল্যবোধের স্তম্ভগুলো; গণতন্ত্র হয় সমরতন্ত্র শাসিত; জাতিশোষণ রূপান্তরিত হয় শ্রেণিশোষণে; আর সহস্র কোটিপতির রসদ যোগাতে গিয়ে শুকিয়ে ওঠে সদ্য স্বাধীন দেশের দুর্বল অস্তিত্বমূল।' (সেলিম, ২০০৮ : ২৬)

এই হত্যোদম সময়ে দাঁড়িয়ে নাট্যকর্মীরা গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের পথে সংগ্রামে সামিল হয়। ১৯৮২ সালে সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তারা পথে নামে। তাদের মজ্জায় সঞ্চারিত মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ও সাধনা। ১৯৮৬ সালে ছাত্রদের উপর নির্বিচারে গুলি চললে নাট্যকর্মীরা গণআন্দোলন গড়ে তোলে, পথ নাটক হয়ে ওঠে সেই গণ-আন্দোলনের হাতিয়ার। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে স্বাগত জানিয়ে তারা মিটিং, মিছিল, অবস্থান ধর্মঘট প্রভৃতি নানাবিধ কর্মসূচিতে জমায়েত মানুষের সামনে পথনাটক নিয়ে হাজির হলো। শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী শাসনকে পরাস্ত করে গণ-অভ্যুত্থানের সাফল্যে নাট্যকর্মীদের অগ্রণী ভূমিকার কথা স্মরণ না করে চলে না।

'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়' এর প্রযোজনা ব্রেশট এর *দ্যা রাইজ এন্ড ফল অব দ্য সিটি অব মেহগোনি* নাটকের আসাদুজ্জামান নূর কর্তৃক রূপান্তরিত ও নির্দেশিত *মোহ নগরী* (১৯৮২)-তে রূপকথার আশ্রয় উঠে এল বিকারহীন অমানবিক কর্মকাণ্ডে আত্মসমর্পিত কৃমিকীটের জীবনের নগ্ন ছবি বা তৎকালীন বাংলাদেশের বাস্তব ছবি। সৈয়দ শামসুল হকের *নূরলদীনের সারাজীবন* (১৯৮২) নাটকে জীবনের বঞ্চনা ও স্বাধীনতার বাসনা নূরলদীনের সংগ্রামের

মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। স্যামুয়েল বেকেটের *ওয়েটিং ফর গডো* নাটকের কবির চৌধুরীকৃত অনুবাদ *গডোর প্রতীক্ষায়* (১৯৮৪) নাটকে হতাশা ব্যর্থতায় অবক্ষয়িত জীবনেও তিনি আশার আলোর সন্ধান দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের *বিসর্জন* (১৯৮৫) অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামির ও আচার সর্বস্বতার ঊর্ধ্বে প্রেমধর্মের বাণী প্রচার করতে চেয়েছেন। আরউইন শ রচিত *বেরি দ্য ডেড* অবলম্বনে জামাল উদ্দীন অনূদিত *কবর দিয়ে দাও* নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে গণকবর থেকে উঠে আসা তরুণ সৈনিকেরা তাদের এই যুদ্ধ, মৃত্যু, ধ্বংসের জন্য দায়ী উচ্চপদস্থ অফিসারদের বিরুদ্ধে চড়াও হয়। কেননা, মুক্তিযুদ্ধের এই পরিণাম তো তাদের কাম্য ছিল না। প্রতিহিংসার সঙ্গে গভীরতর বেদনা এই নাটকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। *মুক্তধারা* (১৯৮০) অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শ্রেণিশোষণের নির্মম ছবি বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন।

'থিয়েটার' নাট্যদল আবদুল্লাহ আল মামুনের *অরক্ষিত মতিঝিল* (১৯৮২) অভিনয়ের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র মতিঝিল ব্যবসায়ীদের অসদাচারে অরক্ষিত হয়ে পড়ার নগ্ন ছবি তুলে ধরেছে। রাশিয়ান নাট্যকার আরবুঝভের ড. আনিসুজ্জামান কর্তৃক রূপান্তরিত নাটক *পুরানো পালা* (১৯৮২) সোভিয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী উপলক্ষ্যে অভিনীত হয়; সৈয়দ শামসুল হক রচিত *এখানে এখন* (১৯৮২) নাটক অভিনয়ের মধ্যদিয়ে দেখানো হয়েছে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বিদেশিদের হাতে ব্যবহৃত হওয়ার থেকে মুক্তি ঘটলেও স্বদেশির হাতেই দেশে বেশি মানুষ ব্যবহৃত হচ্ছে, যা আরও করুণ, মর্মান্তিক। *ম্যাকবেথ* (১৯৮৩) মঞ্চায়নের মধ্যেই আর্ন্তজাতিক নাট্য সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস আছে। এই নাটকের মঞ্চায়নে নির্দেশক ছিল ক্রিষ্টোফার স্যান্ডফোর্ড ও আলোক শব্দ পরিকল্পনায় হাওয়ার্ড হারিসন নামক দুই ইংরেজ। অন্য কুশীলবেরা বাঙালি। যৌথ উদ্যোগে এই প্রয়াস সাড়া জাগিয়েছিল। অতঃপর তারা আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত *এখনও ক্রীতদাস* (১৯৮৩), *বিবিসাব* (১৯৮৬), *তোমরাই* (১৯৮৭), *কুরথী* (১৯৮৮), *কোকিলারা* (১৯৮৯), সৈয়দ শামসুল হকের *যুদ্ধ এবং যুদ্ধ* (১৯৮৬) ইত্যাদি নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যচর্চার ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

'আরণ্যক' আশির দশকে দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামজীবনের সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে মুক্ত নাটকের পাশাপাশি পথনাটকের মধ্যদিয়ে গণসচেতনতা ও জাগরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আরণ্যক এই কালপর্বে অভিনয় করে মামুনুর রশীদের *ইবলিশ* (১৯৮১), *গিনিপিগ* (১৯৮৩), *অববাহিকা* (১৯৮৪), সমতট (১৯৮৮), আবদুল্লাহেল মাহমুদের *সাত পুরুষের ঋণ* (১৯৮২), *নানকার পালা* (১৯৮৫) প্রভৃতি নাটক। এই সমস্ত মঞ্চ নাটকের পাশাপাশি আরণ্যক স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ১৯৮২ হতেই প্রথম পথনাটক *মে দিবস* অভিনয় করে। ১৯৮৩-তে *ক্ষুদিরামের দেশে*, ১৯৮৪-তে *ফেব্রারী নিশান* পথ নাটক অভিনয় করে। এ ছাড়া 'নীলা', *শেকল*, *মৃগনাভী* প্রভৃতি অভিনয় করে। অভিনয়ের মধ্যে রাজনৈতিক বক্তব্য তথা শোষণ, বঞ্চনা, কৃষকের সংগ্রামের কথা উঠে এসেছে। শেক্সপীয়রের *কোরিওলেনাস* (১৯৮৯) নাটক অভিনয়ের মধ্যদিয়ে আরণ্যক বিশ্বনাট্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেছে।

আশির দশকে এসে ঢাকা থিয়েটার সংগ্রামী ও প্রকৃত স্বাধীনতাকামী মানসিকতাকে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়ার মানসে গ্রাম থিয়েটার ধারণা পোষণ করে। সেলিম মোজাহার-এর 'স্বাধীনতা

উত্তর ঢাকা কেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা' গ্রন্থে বলেছেন– 'প্রাণ হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য : গ্রামীণ মেলা কিংবা বাংলার লোকজ শিল্পরীতিগুলো পুনর্জাগরণের আত্মিক অভীপ্সা থেকে যে গ্রাম থিয়েটার; তার সাথে নিবিড় শ্রমসাধ্য সংযুক্তি এবং দেশজ রীতিতে নাট্য নির্মাণের আত্মিক দায়বোধ' (সেলিম, ২০০৮ : ১৫)।

ঢাকা থিয়েটার তার রাজনৈতিক ভাষ্যকে পরিত্যাগ করে গ্রাম থিয়েটারের মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, দুঃখবেদনাকে ভাষা দিতে চাইল। এ মর্মে রচিত ও অভিনীত হলো সেলিম আল দীনের *কিত্তনখোলা* (১৯৮১), *কেরামত মঙ্গল* (১৯৮৩), *বাসন* (১৯৮২), *হাতহদাই* (১৯৮৯), কাইছার আহমদের *বায়ান্নোর শকুন* (১৯৮৩), সুলতান মোহাম্মদ রাজ্জাকের *সংকেত* (১৯৮৭), মোস্তাফিজুর রহমানের *গম্ভীরা পালা* (১৯৮৯) প্রভৃতি। দেশজ নাট্য আঙ্গিকে জনজাতির বিভ্রান্তি, সংশয়, জটিলতা নাট্যগুলির মধ্যদিয়ে মূর্ত হয়ে উঠল।

১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা পদাতিক' নাট্যদল প্রযোজনা করে এস.এম, সোলায়মান রচিত নির্দেশিত *মুখোমুখি কংস* (১৯৮০), *ক্ষ্যাপা পাগলার প্যাঁচাল* (১৯৮০), জসীম উদ্‌দীনের কাহিনী অবলম্বনে *সোজন বাদিয়ার ঘাট* (১৯৮০), *এলেকশান ক্যারিকেচার* (১৯৮০), নিকোলাই গোগল রচনার রূপান্তর *ইন্সপেক্টর জেনারেল* (১৯৮১), বলরাম পণ্ডিতের রচনার জামিল আহমেদ কর্তৃক রূপান্তর *তালপাতার সেপাই* (১৯৮২), এস.এম. সোলায়মান রচিত ও নির্দেশিত *ইংঙ্গিত* (১৯৮৪), *গনি মিঞা একদিন* (১৯৮৬), *এ দেশে এ বেশে* (১৯৮৯), আহমেদ সিদ্দিকী *সক্রেটিসের সন্ধানে* (১৯৮৫), দ্যারিও ফোর তাহ্‌মিনা আহমেদ কর্তৃক রূপান্তর *আহ্ কমরেড* (১৯৮৭), আহমেদ সিদ্দিকীর 'চুরিকেইস' (১৯৮৮), কৃষাণ চন্দর রচিত মাসুম আজিজ রূপান্তরিত *বিচার বিভ্রাট* প্রভৃতি নাটক এবং এগুলো বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছে।

১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে পিপলস্ থিয়েটার এসোসিয়েশনের নাট্য সংগঠন 'লোক নাট্যদল' গঠিত হয়। আধুনিক নাট্য মনস্ক দর্শকদের উপযোগী থিয়েটার সৃষ্টিতে এরা ছিল অঙ্গীকারাবদ্ধ। ভরতেন্দু হরিশচন্দ্র রচিত *অন্ধনগরীর চৌপাট রাজা* (১৯৮১), উইলিয়াম শেক্সপীয়রের *এ মিড সামার নাইটস ড্রীম* (১৯৮২), ব্রেটোল্ট ব্রেশটের *বিবিধ ও ব্যতিক্রম* (১৯৮৯), মুনীর চৌধুরীর *মানুষ* (১৯৮৮), মনোজ মিত্রের *টাপুর টুপুর* (১৯৮৮), নজরুল ইসলামের *শিল্পী* (১৯৮৮), মলিয়রের নাটকের তারিক আনাম খান অনূদিত *কঞ্জুস* (১৯৮৭), প্রভৃতি নাটক বহুবার মঞ্চায়িত করেছিল।

অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের বিস্তৃতিতে বর্তমানের নষ্ট সময়ে বিভ্রান্তমানুষকে সতেজ জীবন দানের বাসনায় ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্টিত হয় 'মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়'। রানা নাসের রচিত *এ লাশ রাখবো কোথায়* (১৯৮৩), *আসমানী* (১৯৮৬), সালাম সাকলাইন রচিত *জাহেন আলীরে ধর* (১৯৮৪) প্রভৃতি মঞ্চ নাটক অভিনয় করে। এছাড়া কাইছার আহমেদ রচিত *বায়ান্নোর শকুন* (১৯৮৪), সেলিম আল দীনের *বাসন* (১৯৮৫), সৈয়দ আবুল কালামের *মাকড়সার জাল ছেড়ার পালা* (১৯৮৭), বিদ্যুৎ করের *শাসন গ্রাসী বান* (১৯৮৮), *দুর্জন দুরহ* (১৯৮৯), প্রভৃতি পথ নাটক অভিনীত হয়।

নাটকে শ্রেণি সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের প্রত্যয় নিয়ে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে 'দৃষ্টিপাত নাট্যদল' গড়ে ওঠে। আব্দুল হালিম আজিজ রচিত ও নির্দেশিত মঞ্চ নাটকগুলি হলো *পোষ্টার* (১৯৮৫), *শেষযুদ্ধ* (১৯৮৬), *চিতেশ্বরের কইতরী* (১৯৮৬), *ইচ্ছামতির কিস্‌সা* (১৯৮৬), 'তিন পুরুষের মাথায়' (১৯৮৯) প্রভৃতি। 'তিনি রাক্ষস' (১৯৮৫), *মহারাজের দেশে* (১৯৮৭), *লড়াই* (১৯৮৮), *রাজার হল সাজা* (১৯৯০) প্রভৃতি পথ নাটকের প্রদর্শনী করেছিলেন। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা মঞ্চ' জামিউর রহমান লেমন রচিত ও নির্দেশিত দুটি পথ নাটক *ঐ ওরা আইতাছে* (১৯৮৫), *কুকুর ও বংশদণ্ড* (১৯৮৭) অভিনয় করে। আবুল মনসুর আহমেদ রচিত 'গ্যালিভারের সফর বৃত্তান্ত' (১৯৮৭), *অথঃকুত্তাশিয়াল চরিতামৃত* (১৯৮৯) দুটি মঞ্চ নাটক অভিনয় করে। স্বাধীনতা ও দেশের সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে তুলে ধরাই ঢাকা মঞ্চের অভিপ্রায় ছিল। ১৯৮৬ তে সুস্থ মননশীলতার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ থিয়েটার' গড়ে উঠে। মীর শামসুল আলম রচিত ও নির্দেশিত *জাহাজের ইঞ্জিল বিকল* (১৯৮৭), *আর কদ্দিন ইষ্টিশনে* (১৯৮৮), *আদালতে প্রেমের গল্প* (১৯৮৯), অভিনীত হয়েছিল। মোহাম্মদ সালেক খানের *মহারানীর কেচ্ছা* (১৯৯০), নাটকটি ও মীর শামশুল আলমের নির্দেশনায় অভিনীত হয়েছিল। ১৯৮৭ তে 'উত্তরা থিয়েটার' মুক্তিযুদ্ধ ও মহান একুশের চেতনা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্দুর হাই দূর্বার রচিত *এরফান বাওয়ালীর কবর* (১৯৮৮), মামুনুর রশীদের *ওরা কদম আলী* (১৯৮৯) আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এখন দুঃসময়* (১৯৯০) প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম দুই দশকে থিয়েটারের গতি প্রকৃতি ক্রমাগত পট বদলের মধ্যদিয়ে এগিয়ে গেছে। প্রথম অর্ধদশকে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের গৌরব, আবেগ ও উদ্দীপনা বাংলাদেশের নাট্যকাঠামোকে আলোড়িত করেছিল। ফলে সেই আবেগের জোয়ারে নাট্যচর্চা ও থিয়েটারের কুশলী উপস্থাপনা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৫ সালে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী ও প্রমোদকর ছাড়ের প্রস্তাব নাট্যাভিনয়ের পথকে কিছুটা সুগম করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেনা অভ্যুত্থানের ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতায় বাংলাদেশের নাটক দিশেহারা হয়ে পড়ে। প্রতিবাদ প্রতিরোধের মাধ্যম হিসাবে নাটক ও থিয়েটার যতটা পল্লবিত হয়ে ওঠে ততটা পুষ্পিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। তবু বহুমুখি ধারার প্রবর্তন দেখা গেছে। বিদেশি নাটক অনুবাদের মধ্য দিয়ে নাট্য বিষয়ের যেমন বিস্তৃতি ঘঠেছে, তেমনি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বিদেশি কলা কৌশল আত্তীকরণের প্রয়াস দেখা গেছে। বিশ্বথিয়েটারের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলার এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য।

১৯৮১ তে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন গড়ে উঠবার পর মুক্তিযুদ্ধের আবেগ কিছুটা অন্তর্হিত হয়েছে। সরাসরি রাজনীতির অঙ্গন ছেড়ে থিয়েটার মানুষের সচেতনতা, অধিকারবোধ জাগ্রত করতে পেরেছে। নাটক মানবিক মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে উঠেছে। নাট্য ভাবনা কে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে শহর থেকে গ্রামের পথে নেমে এসেছে। গ্রাম থিয়েটারের মধ্যদিয়ে নবতর আন্দোলন সংঘঠিত হয়েছে। পথ নাটকের মধ্যদিয়ে নাট্যদল গুলি নাটক নিয়ে মানুষের দরবারে হাজির হয়েছে। ফলে নাট্যবিষয়ে যেমন বদল ঘটেছে, তেমনি নাট্যাঙ্গিক নিয়ে ও তার পরিবেশন পদ্ধতি নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নাটক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে গেছে।

সহায়কপঞ্জি

কাদের সিদ্দিকী (১৯৮৫)। *স্বাধীনতা ৭১*, প্রথম খণ্ড। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০১)। 'বাংলাদেশের নাটকের সন্ধানে'। *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা*, দ্বাদশ বার্ষিক সংকলন, সম্পাদক : ক্ষেত্র গুপ্ত, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা।

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার নির্দেশিকা (২০০৫)। ঢাকা।

মামুনুর রশীদ (২০০৫)। *নির্বাচিত নাটক*। মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা।

রামেন্দু মজুমদার *সম্পা.* (১৯৯৯)। *বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক*। অন্য প্রকাশ, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৯৭)। *রাষ্ট্রের মালিকানা*। বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

সেলিম মোজাহার (২০০৮)। *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকা কেন্দ্রিক মঞ্চ নাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।